দৈনিক জনকণ্ঠ

72

তারিখ AUG. 5 199[illegible]
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

অভিমত

ভুয়া মাদ্রাসা এবং ইসলাম রক্ষার রাজনীতি

ভুয়া মাদ্রাসার স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে নেমেছেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বলছেন, সরকার ইসলামের গায়ে হাত দিয়েছে। সুতরাং আর রক্ষা নেই। সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটাতে হবে। বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সারা দেশের ৬ হাজার ৮৪৭টি মাদ্রাসার মধ্যে মাত্র ২৫১টি মাদ্রাসা চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর মধ্যে ১২৬টি মাদ্রাসার রেজিস্ট্রেশন স্থগিত এবং ১২৫টি মাদ্রাসার কিছু শ্রেণীর ক্ষেত্রে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আর এতেই শুরু হয়েছে হৈ চৈ। ইসলাম রক্ষার নামে ভুয়া মাদ্রাসা রক্ষা আন্দোলনে নেমে গেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের দল বিএনপিও বাদ যায়নি তা থেকে। বরং দলনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে শাসাচ্ছেন, ইসলামের গায়ে হাত দেবেন না। অন্যরা বলছেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং উৎখাত করতে হবে এ সরকারকে। এরই প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা মসজিদে আক্রান্ত হলেন ধর্মপ্রতিমন্ত্রী। সব মিলিয়ে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। অথচ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বার বার বলা হচ্ছে, ভাল মাদ্রাসা যাতে আরও বেশি সরকারী সাহায্য পায় এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত

শিমুল মাহমুদ

মাদ্রাসাগুলো যাতে সত্যিকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে যেসব মাদ্রাসার সরকারী অনুদান ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয়েছে, সেসব মাদ্রাসা সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবে। মন্ত্রণালয়ের পুনর্তদন্তসাপেক্ষে আবার সরকারী অনুদান ও স্বীকৃতি পাওয়া যেতে পারে।

কথা উঠেছে মাদ্রাসা শিক্ষায় দুর্নীতি এবং ভুয়া মাদ্রাসা নিয়ে। এ দুর্নীতি ও ভুয়া মাদ্রাসার স্বরূপটা তাহলে কেমন? ছাত্র নেই, শিক্ষক নেই কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসার স্বীকৃতি নিয়ে মাসে মাসে সরকারী অনুদান উত্তোলন করাই হচ্ছে দুর্নীতির বাস্তব চিত্র। আবার এ রকম মাদ্রাসাও ধরা পড়েছে যার কোন ঘরও নেই, ছাত্র শিক্ষক তো দূরের কথা। ১৯৯৪ সাল থেকে একাধিক তদন্ত রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষায় দুর্নীতি ও ভুয়া মাদ্রাসার সন্ধান পাওয়া যায়। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার কয়েকটি মাদ্রাসা সম্পর্কে '৯৫ সালের ২৩ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হয়, তাতে উল্লেখ করা হয়, এই থানার বেশিরভাগ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় সরকারী অনুদান লোপাটের উদ্দেশ্যে। এ কারণে ৮০ ভাগ মাদ্রাসারই প্রয়োজনীয় ঘর বা শ্রেণীকক্ষ, জমি, আসবাবপত্র, এমনকি ছাত্রছাত্রীই নেই। তবে কাগজে-কলমে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখানো হলেও বাস্তবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সরকারী অনুদান অব্যাহত রাখার জন্য কোন কোন মাদ্রাসা হাই স্কুলের ছাত্র, এসএসসি ফেল করা ছাত্র, এমনকি অন্য ভাল মাদ্রাসা থেকে টাকা দিয়ে ছাত্র ভাড়া করে আনার অভিযোগও পাওয়া গেছে।

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকারীদের উদাহরণ দিয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ঝালকাঠির রাজাপুর থানার তালুকদার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়নাল আবেদিন নিজামিয়া গ্রামে তার বাড়ি সংলগ্ন ২টি মাদ্রাসা ও ২টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। একটি মাদ্রাসা তার মায়ের নামে নিজামিয়া মাজেদুন্নেছা বালিকা মাদ্রাসা এবং অপরটি তার স্ত্রীর নামে নিজামিয়া হাসিনা বেগম দাখিল মাদ্রাসা। এ দু'টি মাদ্রাসার দূরত্ব ৫শ' গজ মাত্র। মাদ্রাসা দুটো মূলত দু'টি কুঁড়ে ঘর। আগাছায় ছাওয়া এ কুঁড়ে ঘর দু'টি ঝড়-বৃষ্টিতে গবাদিপশুর আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। একইভাবে অপর এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক একই কমপ্লেক্সে ১টি কলেজ, ১টি বালক ও ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ২টি দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন মাদ্রাসার তথাকথিত মাওলানারা নিজেদের বাড়ির কাছে এ রকম মাদ্রাসা স্থাপন করেছে।

'৯৫ সালের জুনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপর একটি টিম বরিশালের বিভিন্ন মাদ্রাসা পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়ে আরেকটি প্রতিবেদন দাখিল করে। এতে সুন্দরকাঠি গরিবুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকদের অনুদান বন্ধের সুপারিশ করে বিস্তারিত ব্যাখায় বলা হয়, এ মাদ্রাসার নামে দুটো শূন্য ঘর গরু-ছাগলের মলমূত্রে পূর্ণ। কয়েকটি বেঞ্চ ও চেয়ার থাকলেও ছাত্রছাত্রী নেই। এ রকম আরও বেশ কিছু মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ ও স্বীকৃতি প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়।

একইভাবে বর্তমান সরকারের আমলে '৯৭ সালের মার্চে অপর একটি তদন্ত টিম কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানার মাদ্রাসাগুলো পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দেয়। এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত এবং ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত মাদ্রাসার সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা যায়। এ রকম দুর্দান্ত দুর্নীতির রিপোর্ট পাবার পরও মন্ত্রণালয় মাত্র ২৫১টি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। তাতেই ইসলাম রক্ষার রাজনীতি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। অথচ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত এবং ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া জরুরী ছিল। এটা করা হলে ধর্মীয় শিক্ষার নামে রাষ্ট্রীয় অর্থ লোপাটের মতো গর্হিত ও অধর্ম কাজের উপযুক্ত শাস্তি হতো। যারা এ জাতীয় ভুয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের মূল টার্গেট হলো সরকারী অনুদান। অন্য কথায় যাকে বলে এমপিওভুক্তি। এ 'মান্থলি পেঅর্ডার'-এর লোভেই তারা ধর্মীয় শিক্ষার নামে দুর্নীতিতে মেতে উঠেছে। ছাত্র-শিক্ষক নেই, এমনকি মাদ্রাসা ঘর-ক্লাস রুম পর্যন্ত নেই। শুধু কিছু কাগজপত্র জমা দেয়া আছে সংশ্লিষ্ট দফতরে। এভাবে বছরের পর বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে ভুয়া মাদ্রাসা স্থাপন করে সরকারী অর্থ লোপাটের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার নৈতিক ভিতকেই উপড়ে ফেলতে চাইছে এক শ্রেণীর ধান্ধাবাজ। এ রকম অসংখ্য ভুয়া মাদ্রাসা বিভিন্ন সময় চিহ্নিত হলেও রাজনৈতিক প্রয়োজনে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং নতুন নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের নামে সরকারী অর্থ লোপাটের রাস্তা তৈরি করা হয়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বেশ দেরিতে হলেও এসব ভুয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। এটা একটা গঠনমূলক দিক। এ উদ্যোগটি আরও আগেই নেয়া উচিত ছিল।

দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ভুয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে মাদ্রাসা শিক্ষা সঙ্কোচনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষাই অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার চাইতে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত অঙ্গন। এক হিসাবে দেখা গেছে, স্কুল-কলেজের তুলনায় মাদ্রাসাপ্রতি সরকারী অনুদান পাওয়া শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। একটি দাখিল মাদ্রাসায় অনুদান পাওয়া শিক্ষকের সংখ্যা ১৪। অথচ একই স্তরের মাধ্যমিক স্কুলে এ ধরনের শিক্ষক ১২ জন। আলিম স্তরে অনুদান পান ১৯ শিক্ষক। কিন্তু কলেজে ১৬ জন। অথচ মাদ্রাসার তুলনায় স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। সরকার প্রতিটি দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার ৮০ ভাগ অনুদান বাবদ মাসে ৩৪ হাজার ৫৯০ টাকা, আলিমে ৩৯ হাজার ৫৪০ টাকা, ফাজিলে ৭৮ হাজার ৩১০ টাকা, কামিলে ১ লাখ ৬ হাজার ৬২০ টাকা ব্যয় করে। এ ব্যয়ের পরিমাণ স্কুল ও কলেজের তুলনায় অনেক বেশি। যে ২৫১টি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেগুলোতে সরকারের বছরে প্রায় ১৪ কোটি টাকা অপচয় হতো। উল্লেখ্য, সারা দেশের সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত ১ লাখ ১২ হাজার ৪৪৭ শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৪৭ জনের অনুদান স্থগিত রাখা হয়েছে। মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্যও বর্তমান সরকারের বরাদ্দ বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ২০৪ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ করা হয় ৩২৯ কোটি টাকা।

দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে সরকার একটি সাহসী কাজের সূচনা করেছে। এটা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষার নামে কোথায় কি পরিমাণ অপচয় হচ্ছে সেসব চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ আরও ত্বরান্বিত করা দরকার। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন অবদান তো রাখেই না, বরং ধর্মীয় উগ্রতা ও কুসংস্কারের ক্ষেত্রকে বিকশিত করে প্রগতির যাবতীয় অর্জনকে ধূলিসাত করে দিতে চায়। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষার নামে উৎকট ধান্ধাবাজির ব্যবসা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করা দরকার। এ সরকারী উদ্যোগ নিয়ে রাজনীতির কোন সুযোগ নেই। যারা সরকারের বিরুদ্ধে ইসলাম রক্ষার আন্দোলনে মেতেছে তাদের মতলব ইসলামের পক্ষে নয়। তাদের মতলব রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে। সুতরাং ভুয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কারণে যারা ইসলাম রক্ষার নামে মাঠ গরম করতে চাইছেন তাঁদের আমল না দেয়াই ভাল। বরং এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নামে সরকারী অর্থ লোপাটকারী প্রতারকদের স্বরূপ উন্মোচন করে শাস্তি দেয়া দরকার। তাহলে তাদের সমর্থনকারীদের মুখোশটাও খুলে যাবে।